লোকসভা কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে সমগ্র মন্ত্রীসভাকেই পদত্যাগ করতে হয়।

সুতরাং ওপরের আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক ভারতরাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি থাকলেও তিনি সতত মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মেনে চলেন। ব্রিটেনের ন্যায় আমাদের দেশেও মন্ত্রীপরিষদ জাতীয় নীতি নির্ধারণ, প্রশাসনকে নেতৃত্বদান এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকে। তাই লাওয়েলের (Lowell) প্রতিধ্বনি করে বলা যায় ভারতে মন্ত্রীপরিষদ হল "রাজনৈতিক তোরণের ভিত্তিপ্রস্তর" ("Keystone of the political arch.")।

১১.৫ ভারতের প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister of India)

ভারতে ব্রিটিশ মডেলে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গণপরিষদে গৃহীত হয়। ফলে ভারতে মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মন্ত্রীপরিষদচালিত সরকারের মতো ভারতেও প্রধানমন্ত্রী শাসনক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই হলেন বেজহটের (Bagehot) ভাষায়, "ক্যাবিনেট সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর" (Keystone of the Cabinet arch)। তাঁকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলি বাস্তবায়িত হয়। ধীরে ধীরে গত পাঁচ দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর হস্তে যেভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতে ভারত সরকারকে "প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার" (Prime Ministerial Form of Government) বললে কোনো অত্যুক্তি হয় না।

রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী

সুতরাং, ভারত সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বিশদ বক্তব্য না-থাকলেও বাস্তবতার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে বিশ্লেষণ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ : সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নেই। শুধু ৭৫ নম্বর ধারায় বলা আছে "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন..." ("The Prime Minister shall be appointed by the President..."।) এবং ৭৫(৩) নম্বর ধারায় বলা আছে "মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকবে" ("The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.")। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ নেই বললেই চলে। বস্তুত, সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুধুমাত্র যখন কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না তখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির কিছু ভূমিকা থাকে। গত পাঁচ দশকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মাত্র দু'তিনবার সমস্যা দেখা যায়; অন্য সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক নির্বাচিত হতে দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতারাই প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তবে ১৯৭৭ সালে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারায় তৎকালীন জনতা দল অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। রাষ্ট্রপতি মোরারজি দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করলে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাবিদার জগজীবন রাম ও চৌধুরি চরণ সিং-এর মধ্যে চরণ সিংকে তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন।

১৯৯১ সালে কোনো দল বা মোর্চা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারায় রাষ্ট্রপতি নরসিমা রাওকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান। একাদশ সাধারণ নির্বাচনের পর কোনো দলই নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পাওয়ায় রাষ্ট্রপতি একক বৃহত্তম দল বি. জে. পি. জোটের অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে ১৩ দিনের মাথায় তিনি পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়াকে প্রধানমন্ত্রী করেন। কংগ্রেস ১৯৯৭ সালে দেবেগৌড়াকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, ফলে ১৯৯৭ সালে আই. কে. গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনেও ত্রিশঙ্কু লোকসভা থাকায় রাষ্ট্রপতি বি. জে. পি. জোটের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ১৩ মাসের মাথায় ১ ভোটের ব্যবধানে অটলবিহারী সরকার ধরাশায়ী হয়। ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনেও কোনো জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি—রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্য সমস্ত বৃহৎ দলগুলিকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানান। সকলে অক্ষমতা জানালে রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘু এন. ডি. এ. জোটের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি তেলেগু দেশম পার্টির সমর্থন নিয়ে (২০০২) এন. ডি. এ. জোটের নেতা হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ২০০৯ সালে মনমোহন সিং-এর ইউ. পি. এ. সরকারও জোট সরকার।

কার্যকাল : সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে লোকসভা আগে ভেঙে গেলে বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে লোকসভার মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

কার্যকাল

সংবিধানে বলা আছে, মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কার্যকালের মেয়াদ লোকসভার আয়ুষ্কালের সমান। ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সবচেয়ে দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি দু'দফায় মোট ১৫ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

বেতন ও ভাতা : ভারতের মূল সংবিধানের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত হারে প্রধানমন্ত্রী বেতন ও ভাতা পাবেন বলে স্থির হয়। তবে এও বলা হয় যে, এই হার ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন না সংসদ আইন প্রণয়ন করে নতুন বেতন হার নির্ধারণ করে। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের থেকে মাসিক ১০০০ টাকা বেশি বেতন পান। এ ছাড়া, অন্যান্য ভাতা, বাড়িভাড়া, মালী, দারোয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি পেয়ে থাকেন এবং গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহারের জন্য সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা : ভারতে প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে উপলব্ধি করতে হলে প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক বিধান ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে বিচার করতেই হয়।

১. রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : সংবিধানে বলা আছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। অনুরূপভাবে সংবিধানের ৭৪(১) নম্বর ধারায় একথাও বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ

রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা

দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে এবং সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারায় বলা আছে প্রধানমন্ত্রী শাসন ও আইন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

যাই হোক, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব প্রধান, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি তাঁর নামে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বোঝাপড়া যত সুসংহত হবে প্রধানমন্ত্রী তত সহজে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তব রূপায়ণ করতে পারবেন। উদাহরণ হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের বোঝাপড়া আর রাজীব গান্ধি ও জৈল সিং-এর বোঝাপড়া এক না-হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দু'জনের ভূমিকায় ফারাক দেখা যায়।

২. মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের প্রধান। তিনি রাষ্ট্রপতিকে যে মর্মে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি তদনুসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন অথবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। মন্ত্রীসভার কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ দপ্তর দেওয়া হবে তা প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। তিনি সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সহায়তায় সরকারের নীতি রূপায়ণ করেন। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেজন্যই প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ বলা হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। যথা—(১) স্বীয় দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের স্থান দিতে হয়। নরসিমা রাও মন্ত্রীসভায় অর্জুন সিং, শারদ পাওয়ার, মাধব রাও সিন্ধিয়া প্রমুখকে তাই দেখা যায়। সম্ভবত, এ কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে "সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য" (Primus inter pares) বলা হয়। (২) সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে যাতে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি থাকে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। (৩) মন্ত্রীসভার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা যাতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, বিশেষ করে তপশিল জাতি ও উপজাতি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করতে হয়। (৪) ভবিষ্যতে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তরুণ ও উদীয়মান নেতাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান করে দিতে হয়। (৫) বর্তমানে গণমাধ্যম, শিল্পপতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রীসভা গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। (৬) মোর্চা রাজনীতি (Coalition Politics) ব্যবস্থা ভারতে বিকশিত হওয়ায় কোন্ দলের উপর কোন্ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হবে সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। রেল দপ্তর নিয়ে টানাপোড়েন সর্বজনবিদিত।

মন্ত্রীপরিষদের প্রধান

সম্প্রতি ভারতের মন্ত্রীপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। মন্ত্রীসভায় কাউকে রাখা না রাখা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষাধিকারে পর্যবসিত। নজির হিসাবে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধির ক্যাবিনেটে দু'নম্বর সদস্য প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাজীব গান্ধি অনায়াসে বাদ দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই পরিবর্ধিত ভূমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে "তারকামণ্ডলীর মধ্যে বিরাজিত চন্দ্র" (inter stellas luna minors) বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের উপরেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং প্রয়োজনে পুনর্বণ্টন করতে পারেন। এ ব্যাপারে রাজীব গান্ধি পরাকাষ্ঠা দেখান। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি ২৪ বার ক্যাবিনেটের রদবদল করেছিলেন।

অনুরূপভাবে, ক্যাবিনেটের সভাপতি হিসাবে তাঁরই নির্দেশে ক্যাবিনেট সভায় যাবতীয় নীতি নির্ধারিত হয়। অনেক সময়ে তিনি একক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীকালে তা ক্যাবিনেটে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ গড়ে তোলেন।

৩. **সংসদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী** : মন্ত্রীপরিষদচালিত সরকারের নিয়ম হল, যে দল সংসদে (নিম্নকক্ষে) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই ক্ষমতাসীন হয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদের মূল নায়ক। তিনিই সরকারি নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংসদের প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য নির্ভর করে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর। কারণ সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে "মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী।"

প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা হিসাবে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেন। যথা—(১) সংসদের সরকারের কার্যক্রম ও নীতি যথাযথভাবে উত্থাপন করা; (২) গৃহীত নীতির ব্যাখ্যা করা; (৩) দলীয় সদস্যের আচরণ

নিয়ন্ত্রণ করা; (৪) সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করা; (৫) সংসদীয় বিতর্কে যোগদান করা এবং দলীয় কর্মী বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে উদ্ধার করা। এ ছাড়া, তিনিই সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি (Bills) উত্থাপন করেন; স্পিকারকে কার্যপরিচালনায় সহযোগিতা করেন। মন্ত্রীসভা যেমন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লোকসভার কাছে যৌথ দায়বদ্ধ তেমনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতেও পারেন। সুতরাং সংসদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

সংসদীয় নেতা

৪. দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থই হল দলীয় সরকার। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অনিবার্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভিত্তি হল দলীয় আনুগত্য। দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী দলীয় নীতি নির্ধারণ করেন এবং সরকারের কর্মসূচির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করেন। বর্তমানে সাধারণ নির্বাচনে দলের সাফল্য বা অসাফল্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। বিশেষত, আমাদের দেশে প্রায়শই প্রধানমন্ত্রী হন দলের সর্বোচ্চ নেতা (High Command)। শাসকদলের প্রধান হিসাবে তাঁকে নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়ন, নির্বাচনী কৌশল, প্রচার অভিযান সব কিছুই স্থির করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দলীয় শৃঙ্খলাও রক্ষা করতে হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কংগ্রেস দলনেতা (হাইকমান্ড) না হওয়ায় তাঁর ক্ষমতা অনেকটাই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে সোনিয়া গান্ধিই শেষ কথা বলেন।

দলনেতা

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব যত সুদৃঢ় হবে তাঁর ভূমিকা ও মর্যাদা তত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী গান্ধির দলের মধ্যে নেতৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। স্বাভাবিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা হয় অনুরূপ। অথচ জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃত্বে সহবস্থান করায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে সংকুচিত হতে দেখি।

৫. জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক বা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জনগণের ধারণা এই পদের মর্যাদা ও ভূমিকাকে স্থির করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমের সহায়তায় নিজের একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চান। তিনি নিয়মিত দূরদর্শন, বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। বিশেষত দূরদর্শন ও বেতার সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এগুলিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে লাগান। দূরদর্শনকে "প্রধানমন্ত্রী দর্শন" বলে বহু ব্যক্তি মন্তব্যও করেন।

জাতীর নেতা

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো নির্দিষ্ট দলের, নির্দিষ্ট এলাকার বা নির্দিষ্ট সরকারের প্রতিমূর্তি না-হয়ে সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে স্বীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তা হলে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ভূমিকা পালন করতে পারেন। নজিরস্বরূপ জওহরলাল নেহরু পরবর্তীকালে যখন 'চাচা নেহরু' হিসাবে পরিচিত হন বা 'জহরকোট' জাতীয় পোশাকে পরিণত হয় তখন জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হন। বস্তুত, দেশের সংকটে বা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী সহজেই সফলতা আনতে পারেন যদি তিনি দলমতের উর্ধ্বে জাতীয় নেতার আসনে সমাসীন হন।

৬. আন্তর্জাতিক নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : কবির ভাষায় "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" যদিও একথা বাস্তবায়িত হতে বহু দেরি তবু এটা স্বীকার করতে পারি না যে, বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকা থাকবে না। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন

আন্তর্জাতিক নেতা

করে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন তাহলে দেশের যে সমস্ত ছোটোখাটো বৈদেশিক সমস্যা আছে তা সহজেই অতিক্রম করতে পারেন।

বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর হাতে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার সব সময়ে থাকে না। জওহরলাল নেহরু পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব নিজে নিলেও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা সাধারণত পররাষ্ট্র দপ্তর স্বতন্ত্র কোনো মন্ত্রীর হাতে দেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব যশোবন্ত সিংহের হাতে অর্পণ করেন (২০০২)। বর্তমানে (২০০৯) এস. এম. কৃষ্ণা বিদেশমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের প্রধান মুখপাত্র। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তিনিই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাসখন্দ চুক্তি, বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি, সিমলা চুক্তির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীরাই করেছেন। এ ছাড়া, কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ভারতের যে সবিশেষ ভূমিকা আছে তা প্রধানমন্ত্রীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা : ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা শুধুমাত্র সাংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা, দলের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে প্রসারিত করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী পদের মূল্যায়ন করলে দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান, অপরদিকে একদল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সহজেই নজরে পড়ে। প্রথমোক্ত শ্রেণিতে পড়েন জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি প্রমুখ, আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন মোরারজি দেশাই, চরণ সিং, ভি. পি. সিং, চন্দ্রশেখর, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ।

বস্তুত, একই হস্তে প্রধানমন্ত্রীত্ব ও দলের সভাপতিত্ব, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের অবিস্থিতি, সংবিধান সংশোধনের সহজ সুযোগ, প্রধানমন্ত্রীপদের রাষ্ট্রপতিকরণ প্রয়াস, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর পদকে যেমন মর্যাদাসম্পন্ন করেছে, পাশাপাশি তেমনি দলীয় কোন্দল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস, সম্মিলিত সরকার গঠন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ততা, মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (IMF) চাপে বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশ অনুমোদন, ডাঙ্কেল চুক্তিতে স্বাক্ষরদান প্রভৃতি কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা জনসমক্ষে হেয় হয়ে পড়েছে।

পদাধিকারী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পদকে কাজে লাগাবেন সে রকম পদমর্যাদা তিনি ভোগ করতে সক্ষম হবেন। তাই জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য দিয়ে ইতি টানতে পারি। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীই। তিনি সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন।... সংবিধানকে বাস্তবায়িত করেন; প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের অপরিহার্য উপাদান" ("The Prime Minister is the *Prime* Minister. He can lay down the policy of Government... in the Constitution; the Prime Minister is the linchpin of Government.")।

১১.৫.১ ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি...